ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

অনুকল্পের যাথার্থ্য নিরূপণ

বর্ধমান জেলার এস. এফ. আই.-এর ওপর গবেষণা শুরু করার পূর্বে গবেষিকার যা অনুকল্প ছিল, তার যথার্থ্য যাচাই করা প্রয়োজন। গবেষিকার অনুকল্প ছিল — সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের একটি বড় অংশ এস. এফ. আই.-এর সদস্যপদ গ্রহণ করলেও ছাত্র-রাজনীতি কিংবা সাধারণ রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে আদৌ তারা আগ্রহী নয়। কেবল নেতৃস্থানীয় ছাত্রছাত্রীরাই রাজ্যের বৃহত্তর রাজনীতির সঙ্গে নিজেদের গভীরভাবে যুক্ত করেন। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত বর্ধমান জেলা তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসমাজ যেভাবে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতেন, পরবর্তী সময়ে, বিশেষত আশির দশকের পর থেকে রাজনীতির প্রতি অনীহা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পাঁচটি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৮৭২ জন ছাত্রছাত্রীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ ক'রে দেখা গেছে যে, ৩৭৫ জন ছাত্রছাত্রী, অর্থাৎ ৪৩ শতাংশ এস. এফ. আই.-এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। এই পরিসংখ্যান থেকে একথা বলা যেতেই পারে যে, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের একটি বড় অংশকে এস. এফ. আই.-এর সদস্যপদ গ্রহণ করতে দেখা গেছে। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এস. এফ. আই.-এর বর্ধমান জেলার সদস্যসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির বিষয়টি গবেষণাপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে। সদস্যসংখ্যা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে যদি নব্বই-এর দশককে ধরা হয়, তাহলে দেখা যায় যে, ১৯৯০ সালে জেলার সদস্যসংখ্যা ছিল ৬৮,৩৫২ এবং ১৯৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৯৩,৩৭৯-এ দাঁড়ায়। জেলার এস. এফ. আই.-এর সদস্যসংখ্যা ১৯৯২ সাল থেকে এক লক্ষ অতিক্রম করেছে এবং ২০০০-২০০১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১,৬০,০৩৮। সুতরাং, একথা বলা যেতে পারে যে, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের একটি বড় অংশ এস. এফ. আই.-এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছে।

এর পর দেখা দরকার যে, এস. এফ. আই.-এর সদস্যরা ছাত্র-রাজনীতি কিংবা সাধারণ রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে আদৌ আগ্রহী কিনা। গবেষণাপত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে এস. এফ. আই.-এর সদস্যরা ছাত্র-রাজনীতি কিংবা সাধারণ রাজনীতিতে কতখানি আগ্রহী, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এস. এফ. আই.-সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মনে করে যে, ছাত্রছাত্রীদের ছাত্র-রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছাত্র-রাজনীতিতে আগ্রহ রয়েছে

খুব কম সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর। কারণ, ৩৭৫ জন ছাত্রছাত্রী এস. এফ. আই.-এর সদস্যপদ গ্রহণ করলেও এই সংগঠনের লক্ষ্য ও কর্মসূচী সম্পর্কে ৭৭.৮৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর কোন ধারণা নেই । কোন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হওয়া বা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করার প্রথম সোপান হলো সেই সংগঠনের আদর্শ, লক্ষ্য, কর্মসূচী প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া। কিন্তু পঞ্চম অধ্যায়ে ৫.১১১ নং সারণীর পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩৭৫ জন এস. এফ. আই.-সদস্যের মধ্যে ২৯২ জন, অর্থাৎ সংগঠন সম্পর্কে কোন ধারণা ছাড়াই সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। উপরন্তু, ৬৬.৬৭ শতাংশ সদস্য মনে করে যে, ছাত্র-রাজনীতি থেকে দূরে থেকেও ছাত্রছাত্রীরা সমাজকল্যাণে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাদের মতে, সমাজকল্যাণের জন্য ছাত্র-রাজনীতি করার প্রয়োজন নেই। ৫.১১৩ নং সারণীতে বিষয়টি দেখানো হয়েছে। সুতরাং, উপরিউক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা ক'রে একথা বলা যেতেই পারে যে, এস. এফ. আই.-এর সাধারণ সদস্যরা ছাত্র সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করলেও ছাত্র-রাজনীতি সম্পর্কে তাদের সম্যক্ ধারণা ও আগ্রহ — দু'টিই অত্যন্ত কম।

ছাত্র-রাজনীতির পর দেখা দরকার যে, সাধারণ রাজনীতিতে এস. এফ. আই.-এর সাধারণ সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে কতখানি আগ্রহী। ৩৭৫ জন সদস্যের অভিমত সমীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, শতকরা ৬২.৬৭ ভাগ এস. এফ. আই.-সদস্য সাধারণ রাজনীতিতে যোগদান করতে আগ্রহী নয়। মাত্র ৩৬.২৭ শতাংশ সদস্য সাধারণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে (সারণী নং ৫.১১৫)। অন্যদিকে, সাধারণ রাজনীতিতে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে অসম্মতি জানিয়েছে শতকরা ৬৬.৬৭ ভাগ সদস্য। কেবল ৩২.৫৩ শতাংশ সদস্যই ছাত্র-রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিতে চায় (সারণী নং ৫.১১৪)। সাধারণ রাজনীতিতে যোগদানের ইচ্ছে না-থাকার কারণ হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য (৫৩.১৯ শতাংশ) বলেছে যে, তাদের রাজনীতি ভাল লাগে না। পঞ্চম অধ্যায়ের ৫.১১৬ নং সারণীতে সাধারণ রাজনীতিতে যোগদানের ইচ্ছে না-থাকার কারণগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাধারণ রাজনীতিতে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণের শতকরা অনুপাত পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, ৫১.৪৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ভোটদান করেনি, নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করেনি ৭৯.২ শতাংশ, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি ৯৮.৬৭ শতাংশ, প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি ৯২.৫৩ শতাংশ, রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে যোগদান করেনি ৮৯.০৬ শতাংশ এবং ৯৩.৮৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী রাজনৈতিক আলোচনাতে অংশগ্রহণ করেনি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের যে-বিভিন্ন রূপ রয়েছে, তার কোন একটিতেও সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য অংশগ্রহণ করেনি। এইসব বিষয় পর্যালোচনা ক'রে একথা বলা যেতেই পারে যে, এস. এফ. আই.-সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সাধারণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে আদৌ আগ্রহী নয়।

এস. এফ. আই.-সদস্যদের পর সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ছাত্র-রাজনীতি এবং সাধারণ রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে কতখানি আগ্রহী, তা পর্যালোচনা করা দরকার। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫টি কলেজের মোট ৮৭২ জন সাধারণ ছাত্রছাত্রীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ ক'রে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে ৫২.১৮ শতাংশ মনে ক'রে যে, ছাত্রছাত্রীদের ছাত্র-রাজনীতি করা উচিত। কিন্তু বাস্তবে ৪৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী এস. এফ. আই.-এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। আবার, এস. এফ. আই.-এর লক্ষ্য ও কর্মসূচী সম্পর্কে মোট ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৭৯.৪৭ ভাগের কোন ধারণাই নেই, অর্থাৎ এস. এফ. আই.-এর লক্ষ্য ও কর্মসূচী সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছে, যা গবেষণাপত্রের

চতুর্থ অধ্যায়ে (৪.১২২ নং সরণীতে) দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে, ৬৭.৪৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী মনে করে যে, রাজনীতি না-ক'রেও সমাজকল্যাণে আত্মনিয়োগ করা যায়। সুতরাং, ছাত্র-রাজনীতিতে যে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ কম, তা বলাই বাহুল্য। মোট ৮৭২ জন ছাত্রছাত্রীর অভিমত সমীক্ষা ক'রে জানা গেছে যে, শতকরা ৬৫.২৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী সাধারণ রাজনীতিতে যোগদান করতে চায় না (সারণী নং ৪.১২৭) এবং শতকরা ৬৮.৯২ ভাগ ছাত্রছাত্রী সাধারণ রাজনীতিতে নেতৃত্ব প্রদান করতেও ইচ্ছুক নয় (সারণী নং ৪.১২৬)। সাধারণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছে না-থাকার অনেকগুলি কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ হলো রাজনীতি ভাল না-লাগা (৩৭.৪৩ শতাংশ) এবং রাজনীতিতে সততা নেই (৩১.৮১ শতাংশ) বলে মনে করা। সাধারণ রাজনীতিতে যোগদানের অনিচ্ছার কারণগুলি দেখানো হয়েছে গবেষণাপত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের ৪.১২৭ নং সারণীতে। সাধারণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিভিন্ন রূপ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৪৫.৩০ ভাগ ছাত্রছাত্রী ভোটদান করেনি, নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করেনি ৭৯.৫৯ শতাংশ, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি ৯৯.০৮ শতাংশ এবং ৯৫.৩০ শতাংশ প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি, ৯২.০৯ শতাংশ রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে যোগদান করেনি এবং ৯৬.১০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেনি। সুতরাং, ভোটদান ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রেই ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যোগদান করেনি (৪.১২৮ নং সারণী)। উপরিউক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা ক'রে বলা যেতে পারে যে, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছাত্র-রাজনীতি কিংবা সাধারণ রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী নয়। উপরন্তু, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দল সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের একটি বড় অংশের কোন ধারণাই নেই।

গবেষিকার দ্বিতীয় অনুমান ছিল এস. এফ. আই.-এর নেতৃস্থানীয় সদস্যরাই রাজ্যের বৃহত্তর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। আশির দশকের প্রথম থেকে নব্বই-এর দশকের শেষ পর্যন্ত এস. এফ. আই.-নেতৃত্বের একটি অংশ সি. পি. আই. (এম)-এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৮২ সালে বর্ধমান জেলার এস. এফ. আই. সদস্যদের মধ্যে সি. পি. আই. (এম)-এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন ১০৫ জন, ১৯৯১ সালে ১৮২ জন এবং ২০০০ সালে ১৭৬ জন (সারণী নং ৫.১২১)। সি. পি. আই. (এম)-এর জেলা কমিটিতে এস. এফ. আই.-এর নেতৃত্ব থেকে এসেছেন ১৯৮২ সালে শতকরা ১৮.১৮ ভাগ, ১৯৯১ সালে ২২.৪১ ভাগ এবং ২০০১-২০০২ সালে শতকরা ২৫.৩০ ভাগ (সারণী নং ৫.১২২)। সত্তরের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত এস. এফ. আই.-নেতৃবৃন্দের মধ্যে শতকরা ৩.৮৪ ভাগ রাজ্য কমিটির সদস্য, শতকরা ১.৯২ ভাগ রাজ্য কমিটির সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য এবং শতকরা ৯.৬২ ভাগ রাজ্যের মন্ত্রী, বিধান সভার সদস্য, জেলা পরিষদের সবাধিপতি, পৌরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন (পঞ্চম অধ্যায়ের সারণী নং ৫.১২৩)। আবার, '৯০-এর দশকে এস.এফ.আই-নেতৃবৃন্দের শতকরা ৩.৪১ ভাগ রাজ্য কমিটির ও ২.২৭ ভাগ রাজ্য কমিটির সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য হয়েছেন এবং শতকরা ১.১৪ ভাগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদ লাভ করেছেন। সুতরাং, উপরিউক্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, বর্ধমান এস. এফ. আই.-এর নেতৃস্থানীয় সদস্যদের একটি অংশ রাজ্যের বৃহত্তর রাজনীতিতে নিজেদের গভীরভাবে যুক্ত করেছেন।

ছাত্র-রাজনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রে দেখা গেছে যে, ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসমাজ যেভাবে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতেন, পরবর্তী সময়ে, বিশেষত আশির দশকের পর থেকে রাজনীতির প্রতি অনীহা তাদের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পূর্বে এ. আই. এস. এফ. স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি জাতীয়

ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। অনুরূপভাবে, পঞ্চাশের দশকের উল্লেখযোগ্য ছাত্র-আন্দোলনের মধ্যে রয়েছে ট্রাম ভাড়া-বিরোধী আন্দোলন, শিক্ষকদের ধর্মঘটের সমর্থনে সংগ্রাম এবং ১৯৫৯ সালের ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন প্রভৃতি। এই ধরনের জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি ছাত্রদের নিজস্ব আন্দোলনও সংগঠিত হয়েছিল। ষাটের দশকের গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের মধ্যে রয়েছে ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কর্মসূচী গ্রহণ, ১৯৬৫ সালে দ্বিতীয়বার ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলন, ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য আন্দোলন ইত্যাদি। এগুলি সম্পর্কে গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৬৭ সালে দু'টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল, যথা — (১) ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় এবং (২) ওই বছরের মে মাসে নকশালবাড়ীর ঘটনা ঘটে, যা অতীতের ধারাবাহিকতাকে ম্লান ক'রে দিয়ে বিদ্রোহী তরুণ প্রজন্মকে এক উগ্রপন্থী চরিত্র দান করেছিল। সারা বাংলা তথা ভারতে হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে জ্বলে উঠেছিল তরুণ প্রজন্ম এবং নকশালপন্থীদের ক্রিয়াকলাপের ফলও হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। আবার, ১৯৬৯ সালে অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে-যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল, ১৯৭০ সালেই তার পতন ঘটে। ওই বছর মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করা হয়। ১৯৭২ সালে নির্বাচনের নামে প্রহসন এবং ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা জারী করা হয়। এক কথায় বলা যায়, সত্তরের দশকে একদিকে নকশালপন্থীদের ধ্বংসাত্মক আন্দোলন এবং অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আকাশে অস্থিরতা — এই দুই-এর নেতিবাচক প্রভাব ছাত্র আন্দোলনের ওপর পড়ে। ছাত্রদের গণ-সংগ্রাম সংগঠিত করার স্পৃহা হারিয়ে যায়।

আশির ও নব্বই-এর দশকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে অন্যতম হলো — 'পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে' দাঁড়িয়ে-থাকা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে শুরু করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিশ শতকের প্রায় প্রথম থেকেই সমাজতন্ত্রের প্রতি মানুষ বিশেষভাবে আকর্ষিত হয়। ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে গেলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে যুক্ত করতে হবে — এই ধরনের মতাদর্শগত অবস্থান থেকেই ছাত্রদের ঐতিহাসিক সংগঠন নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের জন্ম হয়।[১] সেই সমাজতন্ত্র ভেঙে পড়তেই ছাত্র আন্দোলনের ওপর তীব্র প্রতিক্রিয়ার দেখা দেয়। কারণ, ছাত্রসমাজের ধারণা ছিল সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হলেই ছাত্রদের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান হবে। এই ধারণার ওপর তীব্র আঘাত নেমে আসে। সত্তরের দশকের সন্ত্রাসের রেশ কাটতে না কাটতেই সমাজতন্ত্রের দিক থেকে এই আঘাত ছাত্রসমাজের মধ্যে গভীর হতাশার সৃষ্টি করে।

আশির দশক সারা বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে যেমন আলোড়ন তুলেছিল, তেমনই সমাজ ও সংস্কৃতিতেও নতুনত্বের ছাপ ফেলেছিল। এই দশকের প্রথমেই প্রযুক্তি বিপ্লবের প্রভাবে নতুন ধরনের মানসিকতার মানুষের আবির্ভাব ঘটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এরূপ মানসিকতাকে আমেরিকান সাংবাদিকরা 'উপ্পি' নামে অভিহিত করেছেন।[২] পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতেও অনুরূপ মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। এই ধরনের মানুষ হলো স্বচ্ছল জীবনযাত্রাসম্পন্ন ও ভোগবাদ সর্বস্ব। এই নতুন শ্রেণীর মানুষের মূল্যবোধহীনতা এবং ভোগসর্বস্ব ও আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও প্রসারিত হয়। স্বভাবতই পরিবারের এই আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরাও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে অ-রাজনৈতিক মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে। নব্বই-এর দশকের অন্য একটি নতুন সমস্যা হলো সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান। এর ফলে ছাত্রসমাজের একটি বড় অংশ রাজনীতি বিমুখ হয়ে পড়ে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আশির দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলনের যে-পরিবেশ ছিল, ১৯৮৬-৮৭ সালের পর থেকে তার পরিবর্তন ঘটে। ওই সময় একদিকে যেমন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পতনের ফলে ছাত্রসমাজের মধ্যে গভীর হতাশার জন্ম হয়, অন্যদিকে তেমনি প্রায় একই সঙ্গে 'মুক্ত বাজারের দর্শন' ছাত্রসমাজকে পাশ্চাত্যমুখী হতে অনুপ্রাণিত করে। এই ঝোঁক যে কেবল উচ্চবিত্ত পরিবার থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, মধ্য ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রীরাও তা অনুকরণ করতে থাকে। বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমগুলি, বিশেষত দূরদর্শনের পর্দায় যে-ধরনের অনুষ্ঠান দেখানো হয়ে থাকে, তার ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিকৃত মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, এই ধরনের অনুষ্ঠানে তরুণ মনের হাতাশাকে বেশী করে তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা দেখে যে, সততা ও দুর্নীতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এই দুই-এর মধ্যে কোন তফাৎ তারা খুঁজে পায় না। ফলে প্রচার মাধ্যমের প্রচার কৌশলে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্নও প্রায় বিলীন হওয়ার মুখে। তার ওপর রয়েছে অবাধ প্রতিযোগিতার চাপ। খুব ছোট অবস্থা থেকেই এই প্রতিযোগিতা শুরু হয় ছাত্র-মনে। বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরিবারের মধ্যে বাবা-মার চাহিদা বাড়তে থাকে। সবাই চান তাঁদের ছেলেমেয়ে 'ফার্স্ট' হয়। পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধূলা, গান-বাজনা, সাঁতার প্রভৃতিতেও প্রথম হতে হবে — অভিভাবকরা এমনই আশা করেন তাঁদের সন্তানদের কাছ থেকে। বাবা-মার এই আকাশচুম্বি চাহিদা সব ছেলেমেয়ের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হয় না। আবার, ছাত্রছাত্রীরা একটু বড় হয়ে ক্যাম্পাসগুলিতে গিয়ে দেখে যে, সেখানেও অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা চলছে। এইসব কারণে ছাত্রছাত্রীদের মনে গভীর অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়। তাছাড়া, অপরাধ প্রবণতা, বিকৃত সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ এবং বিকৃত রুচি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এর মধ্যে আবার নতুন উপসর্গ হিসেবে নব্বই-এর দশকে এসে হাজির হয়েছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। এর ফলে ছাত্রসমাজ আরও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে আদর্শবোধ হারিয়ে যেতে থাকে।

রাজনীতির প্রতি ছাত্রসমাজের অনীহার কারণ

রাজনীতিকে একটি সামাজিক কর্তব্য বলে ধরা যেতে পারে। এই সমাজে যেমন প্রযুক্তিবিদ, চিকিৎসক, আইনজীবী অথবা শিক্ষকদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তেমনি রাজনীতিবিদদেরও প্রয়োজন আছে। এমন কোন সমাজের কথা বলা যায় না, যেখানে রাজনীতিবিদের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে। বরং, বলা যেতে পারে যে, রাজনীতিবিদদের প্রয়োজন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটা সময় ছিল, যখন কেবল রাজপরিবারের লোকেরাই রাজনীতি করতো। পরে যখন গণতন্ত্র এল, তখন সাধারণ মানুষ রাজনীতিতে যোগদান করতে শুরু করলো। সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা দেশের কথা ভাবে, মানুষের কথা ভাবে ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবে, তাদেরই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত এবং বাস্তবে ঘটেছেও তা-ই। সামাজিক কর্তব্য হিসেবে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ছাত্রসমাজও রাজনীতিতে এসেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আশির দশক থেকে ছাত্রসমাজের রাজনীতির প্রতি অনীহা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। এরূপ অ-রাজনৈতিক মানসিকতা সৃষ্টির কারণ অন্বেষণ করা একান্তভাবেই প্রয়োজন; অন্যথায় সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। ছাত্রদের রাজনীতির প্রতি অনীহার বিভিন্ন কারণের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলো :

(১) মূল্যবোধহীন রাজনীতি

স্বাধীনতার পূর্বে এবং স্বাধীনতার পরে, এমনকি ষাটের দশকেও ছাত্র-নেতৃত্বের আত্মত্যাগ ও পার্টির প্রতি ভালবাসা দৃষ্টান্তমূলক হয়ে রয়েছে। ব্যক্তিস্বার্থ অপেক্ষা দেশ তথা সমগ্র সমাজের স্বার্থই তাদের কাছে অনেক বড় ছিল। তাই তখন বড় চাকুরীর মোহ, আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদ, উচ্চ বিত্তশালীর মর্যাদালাভের মতো চাহিদাগুলি ছাত্র-নেতৃত্বকে গ্রাস করতে পারেনি। তখনও তাদের এই নীতিবোধ ছিল যে, তারা দেশের জন্য কাজ করতে এসেছে; নিজের পরিবারকে উচ্চবিত্ত পরিবারে রূপান্তরিত করতে রাজনীতিতে আসেনি। কিন্তু আশির দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে পাশ্চাত্যের অনুকরণে ভোগবাদে প্রলুব্ধ হওয়ার ফলে ধীরে ধীরে সমাজের স্বার্থচিন্তা অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা অনেক বড় হয়ে দাঁড়াল। নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটলো। এর ফলে মূল্যবোধের রাজনীতি মূল্যবোধহীন রাজনীতিতে পর্যবসিত হলো।

(২) জঙ্গি-আন্দোলনের অভাব

প্রথমত, সত্তরের দশক পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলন যেভাবে জঙ্গি আন্দোলনে রূপান্তরিত হতো, আশির দশক থেকে ছাত্র আন্দোলনের সেই রূপ আর প্রত্যক্ষ করা যায় না। ষাটের দশকে ভিয়েতনামের মুক্তি যুদ্ধ ও কঙ্গোর মুক্তি সংগ্রাম এবং সত্তরের দশকে নিকারাগুয়ার মুক্তি সংগ্রামের প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে জঙ্গি ছাত্র আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। [৩] আন্তর্জাতিক বিষয় ছাড়াও জাতীয় ক্ষেত্রে জঙ্গি ছাত্র আন্দোলন কম ঘটেনি। স্বাধীনতা ও স্বদেশী আন্দোলনে, পঞ্চাশের দশকে ট্রাম ভাড়া বিরোধী আন্দোলনে, '৫৯ সালে ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনে, ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময়, ১৯৬৫ সালে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি ও ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনে যেভাবে জঙ্গি ছাত্র আন্দোলন সংগঠিতহয়েছে, তা ছাত্রসমাজকে গৌরবান্বিত করে তুলেছিল। আশির দশকের পর থেকে ঠিক সেই অর্থে জঙ্গি আন্দোলন লক্ষ্য করা যায় না। এর ফলে ছাত্র-রাজনীতিতে ছাত্রসমাজ আগের মতো আর আকৃষ্ট হচ্ছে না।

দ্বিতীয়ত, সত্তরের দশকের শেষ দিকে (১৯৭৭) পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সরকারের প্রধান শরিক হলো সি. পি. আই. (এম) এবং এই দলের অন্যতম প্রধান গণ-সংগঠন হলো এস. এফ. আই.। সুতরাং, বামফ্রন্টের প্রধান শরিক দলের গণ-সংগঠন হওয়ার সুবাদে 'বন্ধু সরকার'-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করা এস. এফ. আই.-এর পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে ছাত্র আন্দোলনে আর অতীতের সেই জঙ্গিভাব দেখা যায় না।

তৃতীয়ত, বর্তমানে ছাত্রসমাজের মধ্যে আদর্শের সংকট দেখা দিয়েছে। সত্তরের দশক পর্যন্ত যে-আদর্শকে সামনে রেখে ছাত্রসমাজ ছাত্র আন্দোলনে লিপ্ত হতো, পরবর্তীকালে সেই আদর্শ বিনষ্ট হতে শুরু করে। বিপ্লবের মাধ্যমে বিকল্প সমাজ গঠনের যে-আদর্শ সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের আগে পর্যন্ত ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর তা বড় ধরনের ধাক্কা খায়। ফলে এখন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের কোন আদর্শ ছাত্রদের সামনে নেই। ফলে ছাত্রদের মধ্যে এক ধরনের দিশাহীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং এর ফলে ছাত্র আন্দোলনও তার জঙ্গি মানসিকতা হারিয়ে ফেলছে।

(৩) নেতৃত্বের আদর্শ অনুকরণীয় নয়

একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের মতো ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই নেতৃত্ব দেওয়াকে একটি খেলার টিমের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। খেলোয়াড়দের ক্যাপ্টেনের মতো ছাত্র-

সংগঠনের নেতৃত্বকেও ওপর থেকে সমগ্র টিমকে পরিচালনা করতে হয়। অতীতে এমন একটি সময় ছিল, যখন নেতৃত্বের আচার-আচরণ, বক্তব্য ও আদর্শকে সাধারণ সদস্যরা অনুকরণ করতো। কিন্তু বর্তমানে তথাকথিত নেতৃত্বের আদর্শ, আচার-আচরণ, বক্তব্য ইত্যাদি অনুকরণীয় তো নয়ই; বরং, সাধারণ সদস্যদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করেছে। যারা ছাত্র-রাজনীতি করছে, তাদের একটি অংশ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজনীতি করছে, ছাত্র-স্বার্থে রাজনীতি করছে না। অন্যদিকে, বৃহত্তর রাজনীতির ক্ষেত্রেও বি-রাজনীতিকরণ (apolitical)-এর ঝোঁক রয়েছে। সাধারণ মানুষও নানা ধরনের সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণে বৃহত্তর রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছে না। ভোট দান তথা রাজনীতিতে অংশগ্রহণের হার ক্রমহ্রাসমান। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।

সাল		বামফ্রন্টের ভোটের হার
১৯৭৭	...	৪৫.৯৭
১৯৮২	...	৫২.৫৭
১৯৮৭	...	৫২.৯৬
১৯৯১	...	৪৮.১৭
১৯৯৬	...	৪৯.০৮
২০০১	...	৪৮.৯৯[৪]

উপরিউক্ত সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আশির দশকে যে-হারে বামফ্রন্ট ভোট পেয়েছে, নব্বই-এর দশকে তার থেকে কমে গেছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, বৃহত্তর রাজনীতিতে অ-রাজনৈতিক মানসিকতার অবস্থিতিএবং ছাত্র-নেতৃত্ব তাদের কাজ ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তেমনভাবে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে না পারার জন্য বাম আদর্শ ছাত্রদের তেমনভাবে আকর্ষণ করতে পারছে না। এর ফলে ছাত্রদের মধ্যে রাজনীতিকে পেশা হিসেবে নেওয়ার প্রবণতা ক্রমহ্রাসমান।

(৪) ব্যক্তিগত দলাদলী ও গোষ্ঠী-দ্বন্দ্ব

আজকের ছাত্র-নেতৃত্বের একটি অংশ ভবিষ্যতে বৃহত্তর রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে বা নেতৃত্বে আসবে বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে। কিন্তু সি. পি. আই. (এম)-এর মধ্যে যদি গোষ্ঠী-দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়, তাহলে যোগ্য ছাত্র-নেতৃত্ব পার্টির নেতৃত্বে উঠে আসার সম্ভাবনা কমে যেতে পারে। পার্টির মধ্যে গোষ্ঠী-দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সি. পি. আই. (এম)-এর উনিশতম রাজ্য সম্মেলনের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্টে (১৯৯৮) বলা হয়েছে যে, ১৯৯৬ সালে লোকসভা নির্বাচনের পরে সরকারে যোগদান করার ব্যাপারে পার্টির মধ্যে যে-বিতর্ক শুরু হয়, তা প্রকাশ্যে চলে আসে এবং 'রণকৌশলগত এই বিতর্ক রণনীতিগত বিতর্কের চেহারা নেয়'। ওই সম্মেলনে আরও বলা হয় :

> ... উপর থেকে নিচ পর্যন্ত গোটা পার্টি খাড়াখাড়িভাবে ভাগ হয়ে যায়। জেলা স্তরে 'ক্ষমতা' দখলের

> লক্ষ্যকে সামনে রেখে শাখা স্তর থেকে শুরু করে সমস্ত স্তরের সম্মেলনগুলি পরিচালিত হতে থাকে। সম্মেলনগুলিতে আলোচনায় গণ-আন্দোলন, গণ-সংগঠনের দুর্বলতা ও সে সম্পর্কে ভুলত্রুটি, কর্মীদের চেতনার মান, আত্মস্বার্থ, অনৈতিকতা, অহমিকা, আত্মকেন্দ্রিকতা, শৃঙ্খলাহীনতা, হুকুমদারি — এসব বিষয় পিছনে পড়ে যায় — কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিতর্কই প্রাধান্য পায়। কমিটি গঠনে প্রতি স্তরেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, রাজনৈতিক-সাংগঠনিক যোগ্যতা ও নৈতিকতার বিচারে নেতৃত্ব বাছাই করার প্রক্রিয়া বিপর্যস্ত হয়, গোষ্ঠীগত আনুগত্যের বিচারে সবল পক্ষ দুর্বল পক্ষকে নিশ্চিহ্ন করতে থাকে, রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীকে ২টি ক্ষেত্রে কমিশন গঠন করতে হয়। ... এইসবের ফলে আদর্শচ্যুত, নীতিহীন আত্মস্বার্থবাদীরাও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে বহাল তবিয়তে থাকছেন, তাদের বর্জন করা তো দূরের কথা, তাদের সংশোধনের জন্য সমালোচনা করার প্রক্রিয়াও বর্জিত হচ্ছে।[৫]

এখন যেহেতু সরাসরি এই গণ-সংগঠনটি পার্টির পক্ষ থেকে পরিচালনা করা হয় এবং এই ফ্রন্টে পার্টির পক্ষ থেকে নেতৃত্বও দেওয়া হয়, সেহেতু কমিটি গঠনের সময়ও সি. পি. আই. (এম)-এর গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বের প্রভাব পড়ছে দলের গণ-সংগঠনেও। তাই ১৯৯৯ সালে দেখা যাচ্ছে যে, বিকল্প নেতা খুঁজে না পেয়ে এস. এফ. আই.-এর উচ্চ পদে পর পর তিনবার একই ব্যক্তিকে বসানো হয়। এই বিষয়টিকে অনেকে গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ রাখার কারণ বলেও মনে করেন।[৬]

(৫) বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের দুর্নীতিপরায়ণতা এবং রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন

বর্তমানে রাজনীতিতে এমন ধরনের মানুষকে আসতে দেখা যাচ্ছে, যাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করা। সমাজ-জীবনে অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত, সমাজ-বিরোধী এবং অন্ধকার জগতের লোকেরাও, আজকের দিনে রাজনীতির সামনের সারিতে স্থানলাভ করেন। এর ফলে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ঘটছে। একাধিক খুনের আসামী এবং সমাজ-বিরোধীরাও মন্ত্রী হচ্ছেন; বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা কোটি কোটি টাকা ঘুস নিচ্ছেন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার ক'রে অনৈতিক, অসামাজিক ও অসাংবিধানিক কাজও করছেন। এর ফলে সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা জন্মাচ্ছে যে, মানুষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে কোন-না-কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। সাধারণ মানুষের মতো ছাত্রসমাজও যখন এই স্বার্থপর ও দুর্নীতিগ্রস্থ নেতৃত্ব এবং রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন চোখের সামনে ঘটতে দেখছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতির প্রতি তারা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছে এবং রাজনীতি থেকে নিজেদের সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখছে। একটি দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সংশ্লিষ্ট দেশের নেতৃত্বের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সমাজের মেরুদন্ডসম রাজনৈতিক নেতৃত্বে যদি পচন ধরে, তাহলে গোটা সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অন্যদিকে, ভবিষ্যৎ জীবনে সুনাগরিক হওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে রাজনীতি আবশ্যক। সেই রাজনীতির প্রতি ছাত্রছাত্রীরা যদি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে তার প্রভাব সমাজের ওপর পড়তে বাধ্য।

(৬) পশ্চিমী ভাবধারার অনুপ্রবেশ

সাধারণভাবে আমাদের দেশে যে-কথাটি বহুল প্রচলিত, তা হলো — ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকা উচিত। এই প্রচারটি কেবল আমাদের দেশে আজকের প্রচার নয়, বহুদিন থেকেই পশ্চিমী দেশগুলিতে সাধারণ মানুষকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার হাতিয়ার হিসেবে এরূপ প্রচার চালানো হয়েছে। তারা রাজনীতিকে মুষ্টিমেয়

মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত রাখতে চায়। বিশেষ ক'রে আমেরিকায় দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণ মানুষ ক্রমাগত তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে ক্রমশ অনাগ্রহী হয়ে উঠছে। এর অর্থ হলো — সাধারণ মানুষ রাজনীতিতে বীতস্পৃহ হয়ে পড়ছে। আমাদের দেশে পশ্চিমী ভাবধারার অনুপ্রবেশ যেভাবে ঘটেছে, তা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই ভাবধারার প্রধানতম লক্ষ্য হলো রাজনীতি, সমাজনীতি ও মানুষের থেকে ছাত্রছাত্রীদের দূরে সরিয়ে রাখা। অন্যদিকে, আত্মকেন্দ্রিকতার মনোভাব এমনভাবে প্রসারিত হচ্ছে যে, এর ফলে কিছু কিছু কট্টর বামপন্থী পরিবারও তাদের সন্তান-সন্ততিদের রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকার পরামর্শ দিচ্ছে এবং নিজের কেরিয়ার তৈরীর দিকে মনোনিবেশ করতে বলছে।[৭]

(৭) বি-রাজনীতিকরণের প্রচেষ্টা

অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সব ছাত্রছাত্রী কখনই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল না। বর্তমানেও ছাত্রছাত্রীদের একটি বড় অংশ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকে না। এই অংশটি কিন্তু বামপন্থী অথবা দক্ষিণপন্থী — কোন সংগঠনের সঙ্গেই যুক্ত নয়। তবে একথা ঠিক যে, বর্তমানে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পক্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে দেশের প্রগতিশীল ধারাকে ব্যাহত করতে চায়, তারা বি-রাজনীতিকরণের পথে ছাত্রসমাজকে পরিচালনা করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে এবং এস. এফ. আই. যথাযথভাবে তার মোকাবিলা করতে পারছে না।[৮]

(৮) রাজনীতির প্রতি আকর্ষণের অভাব

অতীতে ছাত্র-রাজনীতিতে আকর্ষণ অনুভব করার জন্য ছাত্রছাত্রীরা রাজনীতিতে আসত। কিন্তু বর্তমানে রাজনীতিতে তেমন আকর্ষণ বোধ করছে না বলেই ছাত্রছাত্রীরা রাজনীতিতে কম আসছে।[৯]

(৯) সময়োপযোগী শ্লোগানের অভাব

বর্তমানে ছাত্রছাত্রীরা যে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, তার অন্যতম কারণ হলো সমাজব্যবস্থা। একদিকে যেমন সমাজ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারছে না, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে বিদেশী ভোগবাদের হাতছানি। সময়োপযোগী কর্মসূচী নিয়ে যেভাবে তাদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন, এস. এফ. আই. তা সম্পূর্ণরূপে করতে পারছে না। কারণ, এখন শুধু 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্' প্রভৃতি শ্লোগানের মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনকে সংগঠিত করা সম্ভব নয়।[১০] সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও সামাজিক বিষয়ে মনের চাহিদা পূরণ করতে পারে, এমন শ্লোগান এবং ছাত্র আন্দোলনের প্রধান উপজীব্য বিষয়ে আবেগ, স্বতঃস্ফূর্ততা প্রভৃতি তৈরী করতে না পারার জন্য সাধারণ ছাত্র-সমাজ থেকে এস. এফ. আই. দূরে সরে যাচ্ছে।

(১০) উদ্যোগহীন মানসিকতা

ষাটের দশকে ছাত্রদের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যাশা ছিল যে, তারা সমবেতভাবে সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে পারবে। কিন্তু সত্তরের দশকে তাদের সেই আশা পূরণ হয়নি। ফলে ছাত্রদের একটি বড় অংশ সমাজকে অপরিবর্তনীয় ভাবতে শুরু করে। তার ফলে সমাজকে পরিবর্তন করার পরিবর্তে মিডিয়ার প্রচার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজের কেরিয়ার তৈরী করার কথাই তারা বেশী করে ভাবতে থাকে। তাছাড়া, ছাত্ররা সমবেতভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গিয়ে

দেখে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা পার্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ফলে এক ধরনের উদ্যোগহীন ও আশাহীন মানসিকতা তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে। ফলে তারা রাজনীতি থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।[১১]

(১১) ছাত্র-নেতৃত্ব বা সংগঠকদের দুর্বলতা

ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাওয়ার পেছনে এস. এফ. আই.-সংগঠকদের দুর্বলতাও অনেকাংশে দায়ী। 'রাজনীতি'কে সঠিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরাটাই ছাত্র-নেতৃত্বের কাজ। সেই জায়গায় যথেষ্ট ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে ১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্য কমিটির সভায় আলোচনার জন্য যে-'নোট' টি পেশ করা হয়েছিল, সেখানে বলা হয়েছে :

> ... যেক্ষেত্রে আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা আছে, আমাদের সংসদ পরিচালনার ত্রুটি আছে, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে আমাদের বিচ্ছিন্নতা জন্ম নিয়েছে, আমাদের কর্মীরা রাজনৈতিক প্রচারে ব্যর্থ হয়েছে, আমাদের সংগঠন বা সংসদ ছাত্র-ছাত্রীদের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলির প্রতিফলন ঘটাতে পারছে না এবং সেখানে এস. এফ. আই. কর্মীরা ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন সমস্যা, শিক্ষাগত দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন ও ধারাবহিক কাজের মধ্যে দিয়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের বন্ধু হতে ব্যর্থ হচ্ছে সেই সকল ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের অরাজনীতির প্রবণতা আমাদের থেকে দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সংগঠনের কর্মী ও নেতাদের আবার ব্যবহারগত দিকটিও ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্নতার অন্যতম একটি উপাদান। ... [১২]

তাছাড়া, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিষ্ঠান-বিরোধী মানসিকতা যেহেতু বর্তমান থাকে, সেহেতু বামফ্রন্ট-শাসিত পশ্চিমবঙ্গে বাম আদর্শের প্রতি অনুরাগে ভাঁটা কিছুটা হলেও যে পড়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বামফ্রন্টের আমলে ছাত্রছাত্রী জন্মেছে এবং বড় হয়েছে, তারা বাম আদর্শের ক্রান্তিকারী রূপটিকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পায়নি। তাই বাম আদর্শ তাদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে পারছে না।[১৩]

আবার, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে, হাল ধরার মতো যোগ্য নেতা খুঁজে না পেয়ে ছাত্র ফেডারেশনের শীর্ষপদে অছাত্র পুরানো নেতাদেরই রেখে দেওয়া হচ্ছে।[১৪] পুরোপুরি দলের ছাত্রছায়ায় থেকে সংগঠন পরিচালনার অভ্যাসও এস. এফ. আই.-কে সাধারণ ছাত্রদের থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে বলে অনেকে মনে করেন। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্র সংগঠনের প্রচার, কর্মসূচী প্রভৃতি হুবহু পার্টির মতো হওয়ায় পতাকা ছাড়া সি. পি. আই. (এম)-এর সঙ্গে এস. এফ. আই.-এর আর কোন পার্থক্য থাকছে না বলেও অনেকের অভিমত।[১৫] অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো — সি. পি. আই. (এম)-এর পক্ষ থেকে সাব-কমিটিতে যাঁরা ছাত্রদের দায়িত্বে থাকছেন, ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিকতা বোঝার ক্ষমতা যদি তাঁদের না থাকে (অর্থাৎ ছাত্র আন্দোলন থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থেকে ফ্রন্ট পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে), তাহলে ছাত্র-সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য।

সি. পি. আই-এর ছাত্র সংগঠন এ. আই. এস. এফ.-এর বক্তব্য হলো — ভাল রেজাল্ট-করা ছাত্ররা বর্তমানে ছাত্র আন্দোলনে আসছে না। কারণ, আজকের চলতি রাজনীতি ছাত্রসমাজকে আকর্ষণ করতে পারছে না। রাজনৈতিক শক্তি বা সংগঠনের প্রতি ছাত্রসমাজের আস্থা কমছে। তাদের অনাস্থা রাজনীতির প্রতি নয়, রাজনীতির দেউলিয়া রূপের প্রতি। ন্যায়নীতিহীন রাজনীতির প্রতি ছাত্রসমাজ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছে। কংগ্রেসের মতোই বামপন্থীদের একটি অংশের মধ্যেও এই বিচ্যুতি ছাত্রসমাজ ও সাধারণ মানুষকে হতাশ করে তুলেছে।[১৬]

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, বিভিন্ন কারণে আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা গড়ে ওঠার ফলে ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সংখ্যা অতীতের তুলনায় কমে গেছে। প্রসঙ্গত আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা যে কেবল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই রয়েছে তা-ই নয়, আজকের সমাজের সর্বস্তরেই এই মানসিকতা গড়ে উঠেছে। সমাজের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই দেখা যাবে, যে-ভারতে যৌথ পরিবার প্রথা এক সময় বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের ঈর্ষার কারণ ছিল, সেই ভারতে বর্তমানে 'বৃদ্ধাবাস'-এর সংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খুব দ্রুতগতিতে আত্মহত্যার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও আত্মহত্যার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। এখনকার দিনে পাড়ার বিভিন্ন রবীন্দ্র জয়ন্তীর মতো অনুষ্ঠানেও সাধারণ মানুষকে তেমনভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় না। এমনকি, খেলার মাঠও ফাঁকা থাকে। এককথায় বলা যায়, বর্তমান সমাজে মানুষের নতুন ধরনের পরিচিতি গড়ে উঠছে এবং নতুন ধরনের বিচ্ছিন্নতাও জন্ম নিচ্ছে।

ভারতে ছাত্র-আন্দোলন প্রধানত আদর্শগতভাবে পরিচালিত হয়েছে। আদর্শের সঙ্গে জড়িত রয়েছে চেতনার প্রশ্ন। সেই চেতনাকে পচিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত যখন চলছে, তখন তার প্রভাব ছাত্রসমাজের ওপর পড়তে বাধ্য। তাই আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র বা ছাত্রী কোন ডিগ্রী কলেজের কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সমস্যাবলী সম্পর্কে উদাসীন থাকে। তারা মিছিলে যেমন যেতে চায় না, তেমনি মিটিং-এও অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। ক্রমবর্ধমান এই প্রবণতা আজ আর ছাত্রসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, সমাজের সর্বস্তরে তা ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রতিকারের উপায়সমূহ

সমাজ বিচ্ছিন্নতা, হতাশা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে ছাত্রসমাজের মধ্যে বর্তমানে রাজনীতির প্রতি আকর্ষণহীনতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এরূপ মানসিকতা উদ্ভবের কারণ বিশ্লেষণই যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে তা প্রতিরোধের জন্য সুচিন্তিত পথনির্দেশ করা প্রয়োজন।

বর্তমান সমাজ মূল্যবোধহীনতা, অবক্ষয়, দুর্নীতিপরায়ণতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতিতে ভুগছে। আর এর প্রভাব সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে ছাত্রসমাজ তথা সাধারণ মানুষের ওপর পড়ছে। তাই ছাত্রসমাজের রাজনীতি-বিমুখ প্রবণতাকে দূর করতে হলে সমাজের অভ্যন্তর থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। মানুষ গড়ার কারখানায় অভিভাবক, শিক্ষক ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের মতো যাঁরা অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছেন, তাঁদের সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। **প্রথমত**, সন্তানদের নিয়ে অভিভাবকদের প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব ত্যাগ ক'রে তারা যাতে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারে, সেজন্য অভিভাবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। অভিভাবকদের প্রথমে উপলব্ধি করতে হবে যে, প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করলেও একজন ছাত্র বা ছাত্রী ভাল মানুষ না-ও হয়ে উঠতে পারে। সমাজের কথা চিন্তা না ক'রে কেবল নিজের কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত থাকলে সুনাগরিক হয়ে ওঠা যায় না। **দ্বিতীয়ত**, শিক্ষক-সমাজ সমাজের একটি দায়িত্বপূর্ণ জায়গায় অবস্থান করেন। নৈতিক অবক্ষয়, মূল্যবোধহীন মানসিকতা প্রভৃতি থেকে ছাত্রসমাজকে ঊর্ধ্বে তুলে আনার জন্য তাঁদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। শিক্ষালাভের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী — সে বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের ওয়াকিবহাল করতে হবে। একজন ছাত্র বা ছাত্রীর কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে সমাজকে পরিচালনা করার জন্য তার যে দায়বদ্ধতা রয়েছে, সেই বোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে। **সর্বোপরি**, বর্তমান সমাজে যে-পচন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, সেখান থেকে মানুষকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সব রাজনৈতিক দলকে সমাজের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা স্বীকার ক'রে নিয়ে

ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। রাজনীতির অর্থই যে দুর্নীতি নয়, রাজনীতি যে একটি বিজ্ঞান এবং রাজনীতির দ্বারাই যে সুন্দর থেকে সুন্দরতর সমাজে উত্তীর্ণ হওয়া যায় — এই বিশ্বাস ছাত্রসমাজ তথা সাধারণ মানুষের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে, অর্থাৎ রাজনীতির প্রকৃত অর্থ ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। তাদের মধ্যে রাজনীতি করার আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে।

অভিভাবক, শিক্ষক ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে দায়িত্ব গ্রহণের পাশাপাশি রাজনীতিবিমুখ ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতিতে আকৃষ্ট করার জন্য সাংগঠনিক দিক থেকেও সি. পি. আই. এম-কে কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এগুলি হলো :

(ক) এস. এফ. আই.-এর মতাদর্শগত দিক সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করতে হবে। রাজনৈতিক দলের মতো প্রতিটি গণ-সংগঠনেরও মতাদর্শ রয়েছে। এই মতাদর্শকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে ছাত্রছাত্রীরা সংশ্লিষ্ট গণ-সংগঠনের প্রতি নিশ্চিতভাবেই আকৃষ্ট হবে।

(খ) এস. এফ. আই.-এর কর্মসূচী ও তার রূপায়ণের সঙ্গে ব্যাপক সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে সংযুক্ত করতে হবে। কেবল মিছিল বা মিটিং-এর জন্য ছাত্রছাত্রী সংগ্রহ না ক'রে এস. এফ. আই. এবং পার্টির কাজে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ যাতে বৃদ্ধি পায়, সেজন্য উপযুক্ত কর্মশালার আয়োজন ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) এস. এফ. আই.-এর সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার ফলে নির্বাচনী সংগঠন ও কৌশল সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীরা কতখানি ওয়াকিবহাল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হলে একদিকে যেমন ছাত্রছাত্রীরা নির্বাচনী সংগঠন ও কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবে, অন্যদিকে তেমনি মজবুত সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

(ঘ) পরীক্ষিত কর্মীদেরই নেতৃত্বে নিয়ে আসা উচিত। কারণ, নেতৃপদে তাঁদেরই বসানো সমীচীন, যাঁরা ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তে সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। নেতৃবৃন্দ হলেন সমাজের মেরুদন্ড। এই মেরুদন্ড অসুস্থ হলে সমগ্র সমাজব্যবস্থাই ভেঙে পড়বে।

(ঙ) এস. এফ. আই.-নেতৃত্বকে কমিউনিস্টসুলভ মানসিকতাসম্পন্ন হতে হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতি, কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ প্রভৃতি সম্পর্কে নেতৃত্বকে যথেষ্ট পরিমাণে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

(চ) সংগঠনের প্রতিটি স্তরে গণতন্ত্রকে বাস্তবায়িত করার জন্য গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি মেনে চলা উচিত। এস. এফ. আই.-এর সর্বভারতীয় সংগঠন থেকে ইউনিট পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে নেতৃবৃন্দকে মনোনয়নের পরিবর্তে নির্বাচিত হতে, সাধারণ সদস্য ও ছাত্রসমাজের কাছে তাঁদের দায়বদ্ধ থাকতে হবে এবং উচ্চতর কমিটির সিদ্ধান্তকে নিম্নতর কমিটিগুলিকে মেনে চলতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এস. এফ. আই.-এর বিভিন্ন সম্মেলনে আলোচনা করা হয়েছে। ২৬-তম রাজ্য-সম্মেলনে (১৯৯১) বলা হয়েছে :

> আমাদের কমিটিগুলো পরিচালনার ধারার মধ্যেই গুরুতর ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। প্রধান ত্রুটি হলো কমিটিগুলোর কাজকর্ম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ও যৌথভাবে না চালানো। সংগঠন পরিচালনার গণতান্ত্রিক রীতিনীতির

> প্রধান কথা হলো এই যে প্রতিটি প্রধান বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সকলকে খোলামেলা আলোচনার সুযোগ দিতে হবে। এরই সাথে যে বিষয়টি আমাদের মনে রাখা দরকার তা হল প্রত্যেকটি স্তরে আমাদের কমিটিগুলো কেবলমাত্র তার উচ্চতর কমিটি, না নিম্নতর কমিটির কাছেও দায়বদ্ধ থাকবে। সব মিলিয়ে আমাদের সংগঠন দায়বদ্ধ থাকবে সাধারণ সদস্য ও ছাত্র সমাজের কাছে। প্রায়শই এই বিষয়গুলি আমাদের মনে থাকে না [১৭]

(ছ) এস. এফ. আই.-কে জনসাধারণ এবং সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। সংগঠনের নেতৃত্ব জনসাধারণের পাশাপাশি সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যত বেশী যোগাযোগ ও মেলামেশা করতে ও দৈনন্দিন জীবনে তাদের পাশে থাকতে পারবে, সংগঠন তত বেশী সুদৃঢ় হবে এবং মানুষের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

(জ) বর্তমানে এই সংগঠনটি অধিকমাত্রায় কর্মসূচীমুখী হয়ে পড়ছে। তা প্রতিরোধ করতে হলে ইউনিট কমিটির মিটিংগুলিতে সংগঠনের সামগ্রিক ভাবধারা নিয়ে আগামী দিনের ভাবনা-চিন্তাকে তুলে ধরা উচিত। সংগঠকদেরও ভাবাতে এবং সামগ্রিকভাবে মতাদর্শকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, মতাদর্শ ছাড়া কখনই যথার্থ কর্মসূচী প্রণীত ও রূপায়িত হতে পারে না।

(ঝ) যুগোপযোগী ও মনোগ্রাহী কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত। অতীতের কর্মসূচীকে আঁকড়ে না থেকে যুগোপযোগী কর্মসূচী এমনভাবে প্রণয়ন করা উচিত, যাতে ছাত্রছাত্রীরা সেই কর্মসূচীর মধ্যে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করতে পারে। বলা বাহুল্য, তা করা হলে সংগঠনের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। ফলে অনেক বেশী ছাত্রছাত্রী সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসবে।

(ঞ) এস. এফ. আই. সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দুর্বল নেতৃত্ব। যথাযথভাবে তৈরী হওয়ার আগেই বর্তমানে ইউনিটের একজন সদস্য নেতৃত্বে চলে আসছে। যে-নেতৃত্ব সমগ্র সংগঠনকে পরিচালনা করবে, তা সুযোগ্য না হলে এস. এফ. আই.-এর মতো বৃহৎ সংগঠনের ক্ষতি অবধারিত। তাই নেতৃত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে সচেতন না ক'রে দায়িত্ব অর্পণ করা হলে সুসংগঠিত নেতৃত্ব তৈরী হবে না। আর, দক্ষ ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তৈরী না হলে সংগঠনও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। সুতরাং, এই বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে দেখা দরকার।

(ট) নেতৃত্বের আচার-আচরণ, ব্যবহার, কথাবার্তা প্রভৃতি অন্যদের অনুকরণীয় হওয়া উচিত। তাছাড়া, অন্যদের নিয়ন্ত্রণ করার মতো দক্ষতা ও ক্ষমতা নেতৃত্বের থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন। নেতৃত্বের এই গুণগুলি থাকলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে এস. এফ. আই. আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

(ঠ) নেতৃত্বের মধ্যে ত্যাগের মানসিকতা থাকতে হবে। বর্তমান প্রজন্মের সামনে ভোগের দুনিয়া পসরা সাজিয়ে ও প্রলোভন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর, সেই ভোগবাদের আকর্ষণে তরুণ প্রজন্ম গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাচ্ছে। নেতৃত্বকে এই ভোগবাদের আকর্ষণে আকর্ষিত না হয়ে আদর্শবোধকে সামনে রেখে এবং ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে ছাত্র আন্দোলনে নিজেদের নিয়োজিত করতে হবে।

(ড) সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে রাজনৈতিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন করতে হবে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা, রাজনীতির প্রকৃত অর্থ প্রভৃতি বিষয়কে ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। রাজনীতির অর্থ যে দুর্নীতি কিংবা অসীম ক্ষমতালাভ নয় — এই বিষয়গুলি ছাত্রসমাজকে বোঝানো প্রয়োজন।

(ঢ) শিক্ষা শিবিরের সংখ্যা এবং মান বাড়াতে হবে। এস. এফ. আই.-এর ইউনিট কমিটির স্তরেও নিয়মিতভাবে শিক্ষা-শিবিরের আয়োজন করতে হবে। এইভাবে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া বাড়াতে হবে।

(ণ) নেতৃত্বকে মোহ বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে। সংগঠনের সর্বনিম্ন স্তরের কোন কর্মীর যদি জেলা বা রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে পৌঁছানোই একমাত্র লক্ষ্য হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে ছাত্র-স্বার্থ অপেক্ষা আত্মস্বার্থ অগ্রাধিকার লাভ করে। ফলে সংকীর্ণ আত্মস্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

(ত) সমালোচনার পাশাপাশি আত্মসমালোচনার ওপরও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। কারণ, এই আত্মসমালোচনা ছাড়া কোন ব্যক্তি বা সংগঠন সঠিক পথে অগ্রসর হতে পারে না।

(থ) নেতৃত্বকে তাত্ত্বিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হতে হবে। সেজন্য শিক্ষার প্রয়োজন। কেবল তত্ত্বগত জ্ঞান হলেই চলবে না, সেই জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে, অর্থাৎ তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে প্রকৃত নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে।

সূত্র-নির্দেশিকা

১. সুবীর চৌধুরী, 'ছাত্র আন্দোলন : আজকের মুখোমুখি', *শারদ দেশহিতৈষী*, ১৯৯৬, কলকাতা, পৃ. ১৮৯।

২. শুভাশীষ গুপ্ত, *নির্বাচন-সমাজ-মিডিয়া* (পুস্তিকা), পৃ. ১৮৯।

৩. সাক্ষাৎকার, সলিল ভট্টাচার্য (ষাটের দশকের ছাত্র ফেডারেশনের নেতা), ২৬.০৩.২০০১।

৪. *পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার*, ১৯৭৭-২০০২ পৃ. ২২।

৫. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), ঊনিশতম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন, *রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট প্রস্তাব-বিভিন্ন ফ্রন্টের রিপোর্ট*, ২৭-৩০ আগস্ট, ১৯৯৮, পৃ. ৫৫-৫৬।

৬. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৯শে মার্চ, ১৯৯৯।

৭. সাক্ষাৎকার, নিরুপম সেন, ১লা সেপ্টেম্বর, ২০০০।

৮. সাক্ষাৎকার, বিমান বসু, ১২ই অক্টোবর, ২০০২।

৯. সাক্ষাৎকার, গুরুদাস দাশগুপ্ত (সি. পি. আই.- সাংসদ), ১৮ই মে, ২০০২; সৈফুদ্দিন চৌধুরী (পি. ডি. এস.-প্রধান), ১৩ই মার্চ, ২০০১; এবং মদন ঘোষ (সি. পি. আই. (এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য), ৭ই ডিসেম্বর, ২০০০।

১০. সাক্ষাৎকার, সুভাষ চক্রবর্তী (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী), ৮ই নভেম্বর, ২০০১; এবং শ্যামল চক্রবর্তী (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী), ৩০শে মে, ২০০১।

১১. সাক্ষাৎকার, অসীম চ্যাটার্জী (নকশাল নেতা), ১৮ই মে, ২০০২।

১২. ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, রাজ্য কমিটির সভায় আলোচনার নোট, আসানসোল, ১৯৯৪।

১৩. সাক্ষাৎকার, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য (বর্ধমান জেলার আশির দশক থেকে অধ্যাপক আন্দোলনের নেতা), ৫ই এপ্রিল, ২০০১; এবং আভাস রায়চৌধুরী (বর্ধমান জেলার এস. এফ. আই.-এর প্রাক্তন সম্পাদক এবং পরবর্তীকালে রাজ্যের যুবফ্রন্টের নেতা), ৬ই মার্চ, ২০০১।

১৪. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৯শে মার্চ, ১৯৯৯।

১৫. ওই।

১৬. *আজকাল*, ১৯শে জুন, ১৯৯৪।

১৭. ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ২৬-তম সম্মেলনের রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিবেদন, ৭-১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১, পৃ. ৫৩।